প্রথম আলো

তারিখ — 14 MAY 2005 —
পৃষ্ঠা — ৭ — কলাম — ৭ —

উচ্চশিক্ষা আর কত নিচে নামবে?

বিশ্লেষণী দৃষ্টিপাত

ড. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার

শিক্ষকদের বিভিন্ন বর্ণের আবরণে জাতীয় দলীয় রাজনীতির চর্চা এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রধান কর্তব্য লেখাপড়াকে গৌণ বিবেচনা করে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গসংগঠন হিসেবে ভূমিকা পালন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে লেখাপড়ার পরিবেশকে কলুষিত করছে।

শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বিবেচনা করা হলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, আমাদের জাতি এখন ভয়ানক মেরুদণ্ডের ব্যথায় আক্রান্ত। এ ব্যথা মেরুদণ্ডের সর্বনিম্ন স্তর প্রাইমারি পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ স্তর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রের এ ব্যথা অব্যাহত থাকলে তা যে ক্রমান্বয়ে জাতির মস্তিষ্কে আঘাত করে ভবিষ্যতে বড় বিপর্যয় ঘটাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সে জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রের অনিয়ম ও অসঙ্গতি দূর করে এ ক্ষেত্রে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? ক্ষমতায় যে দলই থাকুক না কেন, এরা ছাত্র-শিক্ষকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যতটা নিয়োজিত করতে চায়, তারচেয়ে বেশি চায় যেন তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশে ব্যবহার করতে। সে জন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক ভাবমূর্তি হারিয়ে গিয়ে ক্রমান্বয়ে এগুলোর রাজনৈতিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এটা জাতির জন্য খুবই খারাপ সংবাদ।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে ছাত্র-শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির চর্চা। শিক্ষকদের বিভিন্ন বর্ণের আবরণে জাতীয় দলীয় রাজনীতির চর্চা এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রধান কর্তব্য লেখাপড়াকে গৌণ বিবেচনা করে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গসংগঠন হিসেবে ভূমিকা পালন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে লেখাপড়ার পরিবেশকে কলুষিত করছে। মনে রাখা দরকার, একজন ছাত্রের অনেক পরিচয় থাকতে পারে, কিন্তু তার প্রধান পরিচয় হলো সে ছাত্র। সে স্পোর্টস ক্লাবের সভাপতি, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্য হলে দোষের কিছু নেই, সেগুলো কিন্তু তার প্রধান পরিচয় নয়। একইভাবে একজন ছাত্র অনেক কাজ করতে পারে, কিন্তু তার প্রধান কাজ হলো লেখাপড়া করা। বই পড়া, ক্লাস করা, লাইব্রেরি ওয়ার্ক করা ইত্যাদি কাজ ছাত্রদের প্রধান কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ছাত্রসংগঠন করা, রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করা, দলীয় নেতাদের পেছনে ঘুরঘুর করা কিন্তু ছাত্রদের কাজ হওয়া উচিত নয়। অথচ বাস্তবে অনেক ছাত্রই আজকাল তাদের মুখ্য কাজে অবহেলা করে গৌণ কাজে সময় ব্যয় করছে। শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরিতে তারা যে পরিমাণ সময় ব্যয় করছে, তারচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করছে মিছিলে-মিটিংয়ে, রাজনৈতিক নেতাদের পেছনে ঘুরে, হল দখল, সিট দখল এবং টেন্ডারবাজির মতো অপকাজে জড়িত হয়ে। এটা খুবই দুঃখজনক। আমাদের জানামতে, পৃথিবীর আর কোনো দেশে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ এত কলুষিত হয়নি। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে ছাত্রছাত্রীরা টেন্ডারবাজি, হল দখল, সিট দখলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত নয়। তারা শিক্ষাঙ্গনের বন্দুকযুদ্ধের সঙ্গে পরিচিত নয়; অপরিচিত অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়া, সেশন জট, ক্যাম্পাসে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ধর্মঘট, পুলিশ কর্তৃক ছাত্রাবাস তল্লাশি, ছাত্রী হলে পুলিশ ঢোকা, হরতাল বা ক্যাম্পাসে লাশ পড়ার সঙ্গে। উন্নত দেশগুলো ক্যাম্পাসে একাডেমিক পরিবেশ বজায় রেখে যদি নেতৃত্ব সংকটে না ভোগে এবং সেসব দেশের নেতাদের মান যদি আমাদের দেশের নেতাদের মানের চেয়ে ভালো হয়, তাহলে আমাদের উচ্চশিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক নেতা তৈরির কারখানা বানানো কতটা যুক্তিযুক্ত? স্বীকার না করে উপায় নেই, রাজনৈতিক দলাদলি আমাদের উচ্চশিক্ষাঙ্গনকে এক ভিন্ন নৈরাজ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং অভিনব নেতিবাচক চরিত্র দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেলায় একই কথা বলা যায়। তাদের প্রধান পরিচয় হলো তারা শিক্ষক, তারপর তাদের আরো ১০-২০টা পরিচয় থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলো তাদের প্রধান পরিচয় নয়। তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অনেক কাজ করতে পারেন, কিন্তু তাদের প্রধান কাজ হলো শ্রেণীকক্ষে পাঠদান এবং লেখাপড়া ও গবেষণা করা। বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হয়ে শিক্ষাঙ্গনে দলীয় রাজনীতি চর্চা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল কাজ নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য, অনেক সম্মানিত শিক্ষক আজকাল লেখাপড়ার কাজ কমিয়ে দিয়ে এ কাজেই অধিক মনোযোগ দিচ্ছেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১৯৭৩ সালের যে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশবলে চালিত হয় বলে দাবি করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি চর্চা সে অধ্যাদেশ কর্তৃক উৎসাহ পেয়ে থাকে। উল্লিখিত অধ্যাদেশবলে চালিত হয় বলে দাবি করা হয় বলছি এ জন্য যে, বাস্তবে এ অধ্যাদেশের প্রকৃত কার্যকারিতা দেখা যায় না। অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। দু-একটি নমুনা পেশ করছি—পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটরদের ভোটে নির্বাচিত তিন সদস্যের প্যানেল থেকে মনোনীত ব্যক্তিদেরকে উপাচার্য নিয়োগ করার বিধান অধ্যাদেশে থাকলেও বাস্তবে এর চর্চা বিরল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৬ সালের পর আর কোনো সিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ক্ষমতাসীন দল তাদের পছন্দমতো শিক্ষকদের উপাচার্য, উপউপাচার্য নিয়োগ দিয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া অনুষদের ডিনসহ বিভিন্ন পর্ষদে প্রতিনিধি নির্বাচনে অধ্যাদেশসৃষ্ট ভোটাভুটির রাজনীতি সার্বিকভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক পরিবেশ বিঘ্নিত করে শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থ লালন ও দলাদলির রাজনীতি সৃষ্টি করেছে। বর্ণের আবরণ ছুড়ে ফেলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অধিকতর সরাসরিভাবে রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র সংগঠনগুলোর মিছিল-মিটিংয়ে অংশ নিতেও দেখা যাচ্ছে। এ নিবন্ধ রচনাকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় সম্মানিত শিক্ষককে তাদের মূল দায়িত্বে অবহেলা করে মেয়র নির্বাচনের প্রচারণাকাজে সময় ব্যয় করতে দেখা গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ শিক্ষকদের অবাধ স্বাধীনতা দিলেও তাদের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা উদ্ভাবনে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার মান ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত প্রায় প্রতিটি বার্ষিক প্রতিবেদনেই এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একাডেমিক ভাবমূর্তি হারিয়ে গিয়ে ক্রমান্বয়ে এগুলোর রাজনৈতিক ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠছে

ছাত্র ও শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির চর্চা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পরিবেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে সে বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জানলেও এসব বন্ধের জন্য কমিশন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। মঞ্জুরি কমিশন এবং কমনওয়েলথ অব লার্নিংয়ের যৌথ উদ্যোগে ২০০২ সালের মার্চে 'ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার অন কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স ইন হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত ১৫টি প্রবন্ধে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বিরাজিত সমস্যাবলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। কমিশনের ২০০২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত এ সেমিনারের সুপারিশে (পৃষ্ঠা ১৮-২৮) ছাত্র রাজনীতি নিরুৎসাহিত করার ওপর জোর দিয়ে বলা হয়, 'ছাত্রছাত্রীদের সরাসরি রাজনীতি নিরুৎসাহিত করার উপায় খুঁজতে হবে। এ ছাড়া ছাত্র রাজনীতির ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ যেমন—ক্লাসের সময় মিছিল, ছাত্রাবাসে সিট দখলের রাজনীতি, ঠিকাদারদের কাছ থেকে ছাত্রনেতাদের চাঁদাবাজি প্রভৃতি বন্ধ করার ব্যাপারে জাতীয় রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি'। (ইংরেজি থেকে অনূদিত, পৃষ্ঠা ১৯)। আলোচিত সেমিনারের সুপারিশে ছাত্রদের রাজনীতি নিরুৎসাহিত করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হলেও শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি চর্চা নিরুৎসাহিত করার কথা কিছু বলা হয়নি। শিক্ষক রাজনীতি চলমান রেখে যে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা অসম্ভব তা উল্লিখিত সেমিনারের সুপারিশ রচয়িতারা কি জানতেন না? সম্ভবত প্রবন্ধ উপস্থাপকগণ এবং উল্লিখিত সেমিনারের সুপারিশ রচয়িতাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক এবং চলমান বর্ণের রাজনীতিতে জড়িত হওয়ায় এমনটি ঘটেছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। উল্লেখ্য, শিক্ষক রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কর্মকাণ্ডের জন্য আশংকাজনকভাবে ক্ষতিকর হলেও এ রাজনীতি বন্ধে আলোচিত সুপারিশে উল্লেখ না থাকা যুগপৎ রহস্যজনক ও বেমানান।

উচ্চশিক্ষাকে আরো বেশি নিচে নামিয়েছে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানসম্পন্ন লেখাপড়া হোক বা না হোক বিনিয়োগকারীদের মুনাফাসমৃদ্ধ ব্যবসা কিন্তু ভালোই হচ্ছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক নিজস্ব শিক্ষক না থাকায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ধার করা অতিথি শিক্ষক দিয়ে কাজ চালাচ্ছে। বাড়তি উপার্জনের লক্ষ্যে দু-তিন জায়গায় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অতিথি শিক্ষকদের একদিকে যেমন নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে সময় ও মনোযোগ প্রদান হ্রাস পাচ্ছে তেমনি অন্যদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে না। তবে ছাত্রছাত্রীরা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান থেকে বেশি কিছু শিখতে পারুক আর না পারুক, তারা আকর্ষণীয় গ্রেডসহ স্বচ্ছন্দে পছন্দমতো ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু পরে আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা করতে গেলে এদের লেখাপড়ার দুর্বল মান ধরা পড়ছে।

এরপর আবার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘার মতো এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনিয়োগকারীরা বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন শহরে এদের আঞ্চলিক ক্যাম্পাস স্থাপন করে উচ্চশিক্ষাকে আরো একধাপ নিচে নামানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন। বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেটসহ বিভিন্ন বড় শহরে শাখা ক্যাম্পাস রয়েছে। এসব শাখা স্থাপনে এদের কে অনুমতি দিলেন, কেন অনুমতি দিলেন, কী দেখে অনুমতি দেওয়া হলো তা ভিন্ন গবেষণার বিষয়। মূল ক্যাম্পাসেই যখন লেখাপড়ার বেহাল অবস্থা, সেখানে শাখা ক্যাম্পাসগুলোতে যে লেখাপড়া কেমন মানসম্পন্ন হবে তা বোঝার জন্য খুব বেশি মাথা খাটানোর দরকার হয় না। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাসে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, শিক্ষক হিসেবে যাদের ব্যবহার করা হচ্ছে তাদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়। এসব শিক্ষক কোনো একটি কোর্সের ওপর স্বল্পসংখ্যক বক্তৃতা দিয়ে নিজেরা প্রশ্ন করে নিজেরাই উত্তরপত্র পরীক্ষা করছেন। ফলে ছাত্রছাত্রীরা অনায়াসে আকর্ষণীয় গ্রেড পাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খুশি হচ্ছে এবং অভিভাবকরাও নিজের ছেলেমেয়ের ফলাফল দেখে তৃপ্ত হচ্ছেন। কিন্তু পঠিত বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা যে কী শিখল, গ্র্যাজুয়েটদের মান কেমন হলো সেসব বিষয় খতিয়ে না দেখায় এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সনদপত্রের ওজন ও মান ধরা পড়ছে না।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আঞ্চলিক শাখা স্থাপনের অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে মঞ্জুরি কমিশনের আরো বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ইতিমধ্যে কমিশন যেসব বিশ্ববিদ্যালয়কে আঞ্চলিক ক্যাম্পাস স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে, জরুরি ভিত্তিতে সেসব ক্যাম্পাসের শিক্ষা কার্যক্রমের সার্বিক তদারকির উদ্যোগ নেওয়া দরকার। যদি কোনো আঞ্চলিক ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না বলে তদন্তে প্রতীয়মান হয়, তাহলে সে ক্যাম্পাস যত দ্রুত বন্ধ করে দেওয়া যায় ততই ভালো। রাজনৈতিক চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করে উচ্চশিক্ষার নামে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদপত্র বেচাকেনার ব্যবসা বন্ধ করতে মঞ্জুরি কমিশনের ভূমিকা হওয়া উচিত আপসহীন। কমিশন এ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হলে দেশে উচ্চশিক্ষার মানের ক্রমাবনতি অব্যাহত থাকবে। সে ক্ষেত্রে এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা গ্র্যাজুয়েটরা প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হবেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণের আবরণে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির তীব্রতা থেকে উৎসারিত অনিয়ম আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজিত বিশৃঙ্খলাসমূহ দূর করতে না পারলে দেশব্যাপী একদিকে যেমন ডিগ্রি ও সনদপত্রধারী লোকের সংখ্যা বাড়বে তেমনি অন্যদিকে মানসম্পন্ন শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও কমবে। আর এ প্রক্রিয়া চলমান থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত উচ্চডিগ্রি প্রত্যাশিত গ্রহণযোগ্যতা হারাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া পরিণত হবে প্রহসনে।

ড. মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার : অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।